পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি দৈনিক যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান

আমরা সকলেই ছোটবেলায় ট্রেনে করে যাওয়ার সময় যখন দেখতাম দু'পাশের গাছপালাগুলো হুড়মুড়িয়ে ছুটে পেছনে পালাচ্ছে, মাকে-বাবাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম ব্যাপারটা কী। তাঁরা তাঁদের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু মাথায় কিছুই ঢুকত না। কারণ আমরা চোখে এক দেখতাম, আর বাবা-মা অন্য কিছু বলতেন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস? আরেকটা বিষয় নিয়েও ছোটবেলায় দ্বন্দ্ব ছিল। সে হল সূর্য। আমি দেখতে পাচ্ছি যে সে বেশ স্পষ্ট এপাশ থেকে ওপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সবাই বলে কিনা সে স্থির। কী করে মানি?

শেষ পর্যন্ত মানতে তো হল। কিন্তু তার আগে অনেকদিন এমনও ভেবেছি যে যদি কখনও এই পৃথিবী আর সূর্যের থেকে একটু দূরে গিয়ে দেখা যেত যে কে আসলে ঘুরছে। কাউকেই যে পুরো বিশ্বাস হতো না। নিজের চোখ যা দেখছে তাই যেন সত্যি। কিন্তু গাছের প্রাণ আছে—এটা আমি সহজে মেনে নিয়েছিলাম। যদিও প্রথমে ভাবতাম নড়ে না, চড়ে না, কথা বলে না—প্রাণ কী করে থাকে? তখনও পশু-পাখি আর মানুষকেই প্রাণী ভাবতাম। কিন্তু গাছেদের আলাদা একটা ব্যাপার আছে। তার কোথা থেকে যেন ফুল আসে, ফল আসে, পাতা আসে। এরকম কিছু খেলনা পুতুলের, পড়ার টেবিলের তো হয় না। আমাদের (প্রাণীদের) হয়। তাই গাছের প্রাণী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই তখন মনে হতো।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা তৈরি হয়ে যায়। বুঝে যাই, যা চোখে দেখি আর যারই যা আপাত প্রমাণ থাকুক না কেন, তা দিয়ে কোনও কিছুর সত্যতা বিচার করা যায় না। সব কিছুই বিশেষভাবে যাচাই করতে লাগে। এরপর ভূতের অস্তিত্ব বা গণেশের দুধ খাওয়া এরকম কোনও কিছুই অবিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়নি।

আমাদের বিচার, বুদ্ধি খাটিয়ে যে কোনও কিছুকে গ্রহণ করা বা না-করাই বিজ্ঞান, তাই আমাদের শিক্ষিত হওয়া। বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান।

এরপর শেষ পাতায়

দুইয়ের পাতায়
ক্লাস সিক্স-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ইতিহাস
তিনের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বাংলা
ভূগোল
চারের পাতায়
ক্লাস এইট-এর টিউশন
ইংরেজি
বিজ্ঞান
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ইতিহাস
বাংলা
ছয়ের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভূগোল
ইংরেজি
সাতের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
সাধারণ জ্ঞান
কম্পিউটার
আটের পাতায়
মহান ব্যক্তিত্ব

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

না বুঝে মুখস্থ কোরো না

বাসব মুখোপাধ্যায় সহকারী প্রধান শিক্ষক, দ্য পার্ক ইন্সটিটিউশন, শ্যামবাজার

ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা একান্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র পড়াশোনা করলেই চলবে না, সকল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনীতা রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি তাকে খেলাধুলো ও শরীরচর্চা করতে হবে। এ-বিষয়ের প্রতি বাবা-মা'কে খেয়াল রাখতে হবে। এখন ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যবই পড়ার চল কমে আসছে। বদলে টিভি, মোবাইল এসব নিয়েই তারা বেশি ব্যস্ত থাকছে। এখন মাঠের অভাব, ফলে খেলাধুলো করার অভ্যেসটাও কমে যাচ্ছে। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখতে খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এখন অনেকেই পড়া হয়ে গেলে মোবাইল নিয়ে গেম খেলতে বসে যায়। এতে পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পড়ার পর না দেখে লিখলে পড়াটা ভালো মনে থাকে। অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে বসে গেম খেলে। এতে পড়ার যেমন ক্ষতি হয়, তেমন চোখেরও সমস্যা হতে পারে। বাড়ির বড়দের এই বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে।

যে বিষয়ই পড়ো না কেন পড়াটা সব সময় বুঝে নিয়ে পড়তে হবে। না বুঝে কোনও বিষয় মুখস্থ করা ঠিক নয়। শুধুমাত্র কোচিংয়ে পড়লে হবে না বা রেফারেন্স বই পড়লেও চলবে না। সবার আগে পাঠ্যবইটা ভালো করে পড়তে হবে। পাঠ্যবইটা ভালো করে পড়লে সফল হবেই।

সকল ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্য কামনা করি।

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

পরীক্ষার আগে বার বার লেখার অভ্যাস করি

শুভ্রজিৎ মজুমদার
নবম শ্রেণি, কৃষ্ণনগর দেবনাথ হাইস্কুল

শুভ্রজিৎ মজুমদার ক্লাস নাইন-এ পড়ে। সে পড়াশোনার বিষয়ে খুব নিষ্ঠাবান। তাই স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে খুব ভালবাসেন। শান্ত প্রকৃতির শুভ্রজিতের সারাদিন কাটে পড়াশোনা আর তবলা নিয়ে। পড়তে পড়তে সে কখনও ক্লান্ত হয় না। তবে একঘেয়েমি এলে তার বিনোদন হল তবলা। টিভি দেখা বা গল্পের বই না পড়ে তবলার সঙ্গে সময় কাটাতেই সে সবথেকে ভালোবাসে। বাড়িতে ছোট বোনের পড়াশোনাতেও সাহায্য করা তার একটা দৈনন্দিন কাজ। তার স্বপ্ন অনেকের থেকে একটু আলাদা। বড় হয়ে সে ট্রেনের ড্রাইভার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ছোটবেলায় ট্রেনে চড়ার সময় থেকেই তার এই স্বপ্ন। তাই এখন থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু।

উত্তরণ: তোমার সারাদিনের রুটিনটা একটু বলো।

শুভ্রজিৎ: আমি সকাল ৬টায় উঠে পড়তে বসি। এরপর স্কুল থাকে। বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিয়ে আবার পড়তে বসি।

উত্তরণ: ভালো করে পড়ার জন্যে তুমি কী করো?

শুভ্রজিৎ: আমি আগে বিষয়টা বুঝে নিই। তারপর বারবার লেখা ও পড়ার মধ্যে দিয়ে সেটা অভ্যেস করি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

শুভ্রজিৎ: ভৌতবিজ্ঞান।

উত্তরণ: কেন?

শুভ্রজিৎ: আমার বিষয়টা সহজ লাগে। ভৌতবিজ্ঞানের বিষয়গুলো বুঝে নিলে অনেকটাই পড়া তৈরি হয়ে যায়। ভৌতবিজ্ঞানে চারপাশের বিষয়গুলোর প্রতিফলন দেখতে পাই। তাই সহজেই বুঝতে পারি।

উত্তরণ: তোমার তো সামনের বছর মাধ্যমিক, সেই নিয়ে কিছু ভেবেছ?

শুভ্রজিৎ: উচ্চ মাধ্যমিকে আমি বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করতে চাই। তাই আমায় মাধ্যমিকে খুব ভালো নাম্বার পেতে হবে। অনেক পড়াশোনা করতে হবে।

উত্তরণ: পরীক্ষার আগে কী নিয়মে পড়াশোনা করো?

শুভ্রজিৎ: বার বার লেখার অভ্যেস করি।

উত্তরণ: পড়ার সঙ্গে এখন তো প্রোজেক্ট করতে হয়। সে-সব তোমার কেমন লাগে?

শুভ্রজিৎ: প্রোজেক্টে নিজের মতো কিছু করা যায়। তাই আমার ভালোই লাগে।

উত্তরণ: তোমার অনুপ্রেরণা?

শুভ্রজিৎ: মা ও বাবা। তাঁরা সবসময় আমায় সাহায্য করেন।

উত্তরণ: সবার ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে তোমার সব লক্ষ্য পূরণ করো। সঙ্গে রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

বিজ্ঞানীদের মজার তথ্য

আইজ্যাক নিউটন

স্কুলে তিনি খুব অলস ছাত্র ছিলেন। একদিন ক্লাসে একজন হোমড়া-চোমড়া দুষ্টু ছেলে তার সঙ্গে মশকরা করতে শুরু করে এবং লড়াইয়ে ডাক দেয়। ছোটখাটো চেহারার নিউটন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াইয়ে জেতে আর প্রতিজ্ঞা করে যে এরপর ক্লাসের সবথেকে ভালো ছাত্র হয়ে সে সবাইকে দেখিয়ে দেবে। তার প্রতিজ্ঞা সে সত্যি করে দেখিয়েছিল। অথচ ছোটবেলায় বই পড়া বা লেখালিখি নিউটনের সবথেকে অপছন্দ ছিল।

TEAM উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
তনুশ্রী দাস | সালমা আহমেদ
রেশমি চন্দ্র | চুমকি দাস
এনায়তি দেবদত্ত (শিলচর)

ক্লাস সিক্স-এর টিউশন | বিজ্ঞান

পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ও একক সমূহ

পরিমাপ বলতে আমরা কী বুঝি আজ সেটাই আমাদের জানার বিষয়। দৈনন্দিন জীবনে যে কোনও কিছুর পরিমাণ বুঝতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকেই পরিমাপ বলে।

যেমন তুমি বা তোমার বন্ধুর মধ্যে, কে বেশি লম্বা বা কে বেশি জোরে দৌড়ায় এগুলো বুঝতে গেলে তোমাদের দু'জনের উচ্চতা, দৌড়ের গতি মাপতে হবে। এখানে উচ্চতা, গতি—এর প্রতিটিই হল ভৌত বা প্রাকৃতিক রাশি। যা পরিমাপ করা যায়, তাকেই বলে ভৌত রাশি বা প্রাকৃতিক রাশি।

রাশি দুই প্রকারের—

মৌলিক বা প্রাথমিক রাশি: যে রাশিগুলি অন্য কোনও রাশির উপর নির্ভর করে না, তাদের মৌলিক বা প্রাথমিক রাশি বলে। যেমন—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, সময়, ভর।

লব্ধ রাশি: যে সমস্ত রাশি একাধিক মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল তাকে লব্ধ রাশি বলে। যেমন—আয়তন = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা, গতি = দৈর্ঘ্য / সময়, ঘনত্ব = ভর / আয়তন।

কোনও একটি রাশির পরিমাণ বোঝানোর জন্য ওই রাশিরই একটি সুবিধাজনক পরিমাণকে প্রমাণ বা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে রাশিটি প্রকৃতপক্ষে ওই নির্দিষ্ট মানের কত গুণ তা প্রকাশ করা হয়। রাশিটির ওই প্রমাণ মানকে পরিমাপের একক বলে। যেমন, দৈর্ঘ্য—সেন্টিমিটার, মিটার, ফুট, ইঞ্চি, হাত। ওজন—গ্রাম, কিলোগ্রাম আর সময়—সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা। প্রাথমিক রাশির একক হল প্রাথমিক একক ও লব্ধ রাশির একক হল লব্ধ একক।

একক ব্যবহারের ফলে ব্যক্তি বা স্থানাভেদে একই বস্তুর পরিমাপ ভিন্ন ভিন্ন হবে না। যেমন— প্রাচীনকালে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে বিঘত বা হাত বা পায়ের পাতা ইত্যাদি ব্যবহার হতো। কিন্তু হাতের পাতার মাপ তো একেক জনের একেক রকম, ফলে একই বস্তুর বিভিন্ন দৈর্ঘ্য হতো।

পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির জটিলতা এড়াতে ১৯৬০ সালে তৈরি করা হয় আন্তর্জাতিক SI বা এসআই একক। এই পদ্ধতির সাতটি প্রাথমিক একক: (১) দৈর্ঘ্য-র একক মিটার, (২) ভর-এর একক কিলোগ্রাম, (৩) সময়-এর একক সেকেন্ড, (৪) তড়িৎ প্রবাহ-এর একক অ্যাম্পিয়ার, (৫) আলোক তীব্রতা-র একক ক্যান্ডেলা, (৬) অণু-পরমাণুর পরিমাণ-এর একক মোল এবং ৭) উষ্ণতা-র একক কেলভিন।

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ: আন্তর্জাতিক প্রমাণ মিটার-১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস নামক সংস্থায় 0°C তাপমাত্রায় রাখা প্ল্যাটিনাম (৯০%) ও ইরিডিয়াম (১০%)-এর সংকর ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের দুইপ্রান্তের মাঝের দূরত্বকে সারা বিশ্বে প্রমাণ মিটার বলা হয়। এই প্রমাণ মিটার থেকে তার গুণিতক ও উপগুণিতক এককগুলি তৈরি করা হয়। প্রমাণ মিটারকে ১০ দিয়ে গুণ করে বড় এককগুলি পাওয়া যায়। যেমন, কিলোমিটার, হেক্টোমিটার, ডেকামিটার ইত্যাদিকে বলে গুণিতক একক।

আবার এই প্রমাণ মিটারকে ১০ দিয়ে ভাগ করে ছোট মানের একক পাওয়া যায়। যেমন, ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার ইত্যাদিকে বলে উপগুণিতক একক।

এবার তিনটি রাশির পরিমাপ সম্পর্কে জানব।

ভরের পরিমাপ: এসআই পদ্ধতিতে ভরের পরিমাপের একক হল কিলোগ্রাম। ভর মাপার জন্য দাঁড়িপাল্লা বা সাধারণ তুলাযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তুলাযন্ত্রের একপাত্রে বাটখারা রাখা হয় ও অপর পাত্রে যার ভর মাপা হবে সেই বস্তুকে রাখা হয়। পরিমাপ সঠিক হলে দাঁড়িপাল্লার কাঁটা বা সূচক সাম্যাবস্থায় আসে। ভর মাপার বিভিন্ন এককগুলি হল—

প্রমাণ একক: গ্রাম। গুণিতক একক কিলোগ্রাম, হেক্টোগ্রাম, ডেকাগ্রাম। উপগুণিতক একক—ডেসিগ্রাম, সেন্টিগ্রাম, মিলিগ্রাম।

ক্ষেত্রফলের পরিমাপ: কোনও বস্তু কোনও একটি দ্বিমাত্রিক তলের উপর যতটা জায়গা জুড়ে থাকে সেটিই হল বস্তুটির ক্ষেত্রফল। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল হল ক্ষেত্রটির আয়তকার ক্ষেত্রফল। তেমনই একটি বর্গাকার ক্ষেত্রর যে কোনও দুটি বাহুর গুণফল হল বর্গাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল।

আবার একটি গোলাকার বস্তু যেমন ফুটবলের ক্ষেত্রফল হল, ফুটবলটিকে কাগজ দিয়ে মুড়তে যে পরিমাণ কাগজ লাগে তা একটি তলের উপর যতটা জায়গা জুড়ে থাকে তাকে ওই ফুটবলটির ক্ষেত্রফল বলে।

ফুটবলের ক্ষেত্রফল = π X ফুটবলের ব্যাস X ফুটবলের ব্যাস (π-ধ্রুবক, এর মান ৩.১৪)

একটি ফুটবলকে দুটি বইয়ের ঠিক মাঝে রাখলে বই দু'টির দূরত্বই হল ফুটবলের ব্যাস।

আয়তনের পরিমাপ: কোনও বস্তু ত্রিমাত্রিক তলে যে পরিমাণ স্থান দখল করে থাকে তাকে বস্তুটির আয়তন বলে।

তরল পদার্থকে গায়ে স্কেল অঙ্কিত যে কাচের পাত্রে রেখে মাপা হয় তাকে আয়তন মাপনী চোঙ বলে। এসআই পদ্ধতিতে আয়তনের একক হল ঘন মিটার। এছাড়াও অন্যান্য আয়তনের প্রচলিত একক হল ঘন সেন্টিমিটার (CC), লিটার ইত্যাদি।

১০০০ ঘন সেন্টিমিটার = ১০০ ঘন ডেসিমিটার = ১ লিটার
১ লিটার = ১০০০ মিলিলিটার এবং ১ ঘন সেন্টিমিটার = ১ মিলিলিটার।

ক্লাস সিক্স-এর টিউশন | ইতিহাস

নব্য ধর্ম আন্দোলন

আজ আমাদের পাঠ্য ভারতের নব্য ধর্ম আন্দোলন।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বদলাতে শুরু করে। কৃষি যেমন মানুষের জীবনের ভরণ-পোষণের মূল মাধ্যম ছিল, তেমনি পাশাপাশি জীবিকার জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নতুন নতুন জনপদ তৈরি হয়। মানুষের হাতে অর্থ বাড়তে থাকে। এর আগে অবধি ব্রাহ্মণদের সমাজে খুব প্রতিপত্তি ছিল। ধর্মের বিভিন্ন রীতি-নীতির মধ্যে পশুবলি অন্যতম ছিল। কিন্তু এর ফলে যে পরিমাণ গবাদি পশুর বলি দেওয়া হতো তাতে কৃষকদের ক্ষতি হতো। আবার বাণিজ্যের জন্যে সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন হতো। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মতে সমুদ্রযাত্রাও ছিল পাপ। অর্থের লেনদেন, সুদ নেওয়াও ছিল পাপ। ধর্ম, ঈশ্বর বা পূজ্য বলতে তখন ব্রাহ্মণরাই সব প্রতিপত্তি ও অধিকার দখল করে রেখেছিলেন। তাঁরা পাপ পুণ্যের নাম করে নানারকম পুজো, যজ্ঞের অছিলায় মানুষের কাছ থেকে সমানে অর্থ ও নানারকম সম্পত্তি আদায়ের উপায় খুঁজতেন। তাঁদের কথামতো না চললে জুটত নানারকম শাস্তি। আগে সমাজের শ্রেণিভাগ হতো কাজের ভিত্তিতে। কিন্তু ধর্মের নামে জন্মগত শ্রেণিভাগ শুরু হয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়তে থাকে। জটিলতা তৈরি হয়। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়দের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা দুই-ই বাড়তে থাকে। লোহার তৈরি অস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের ক্ষমতা আরও বাড়ে। ফলে তারা আর ব্রাহ্মণদের অধীনে থাকতে চান না। এই ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা কারণে নতুন ধর্মের চাহিদা তৈরি হয়। সবাই এমন এক ধর্ম চায় যেখানে আড়ম্বর ও মিথ্যাচার কম হবে। এই রকম সময়ে ভারতের নানা প্রান্তে ধর্মের নতুন আঙ্গিক নিয়ে নানা মানুষ নতুন আলোর সঞ্চার করেন। এই ধর্মগুলোকেই নব্য ধর্ম বলে। এদের মধ্যে দু'টি অন্যতম ধর্মমত হল জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। এঁরা ব্রাহ্মণদের ও বেদের রীতিনীতির বদলে এক সহজ সরল জীবন যাপনের পথ দেখিয়ে নতুন ধর্মমত নিয়ে আসেন। এই ধর্মগুলো সম্পর্কে আমাদের আলাদা আলাদা করে জানতে হবে।

জৈন ধর্ম

নতুন ধর্মমতের মধ্যে জৈন ধর্ম ছিল অন্যতম। এর প্রধান প্রচারক ছিলেন তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট ২৪জন তীর্থঙ্কর ছিলেন। এঁদের মধ্যে শেষ দু'জন হলেন পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীর। পার্শ্বনাথ ক্ষত্রিয়, কাশীর রাজপুত্র ছিলেন। তিনি মহাবীরের প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার মানুষ।

বর্ধমান মহাবীর: (খ্রি.পূ. ৫৪০-৪৬৮) ইনিও লিচ্ছবি বংশের ক্ষত্রিয় রাজকুমার ছিলেন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি তপস্যা করতে যান। বারো বছর তপস্যার পরে তিনি সর্বজ্ঞানী হন ও কেবলিন নামে পরিচিত হন। আনুমানিক বাহাত্তর বছর বয়সে পাবা নগরীতে অনশনের পর তাঁর মৃত্যু হয়। তার আগে অবধি তিনি জৈন ধর্ম প্রচার করেন। প্রথমদিকে এই ধর্ম মগধ, বিদেহ, কোশল ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে জনপ্রিয় হয়। পরে মৌর্য যুগে এর প্রভাব বাড়তে থাকে। শোনা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে জৈন হয়ে গিয়েছিলেন। জৈন ধর্মের মূল উপদেশগুলো বারোটি ভাগে ভাগ করা যায়। এদের একেকটিকে অঙ্গ বলে। আর এদের একসঙ্গে দ্বাদশ অঙ্গ বলে।

চতুর্যাম ও পঞ্চমহাব্রত: জৈন ধর্মে মূল চারটি নীতি ছিল—১) কোনও প্রাণী হত্যা করা যাবে না, ২) মিথ্যা কথা বলা যাবে না, ৩) অন্যের জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না, এবং ৪) নিজের জন্যে কোনও সম্পত্তি করা যাবে না।

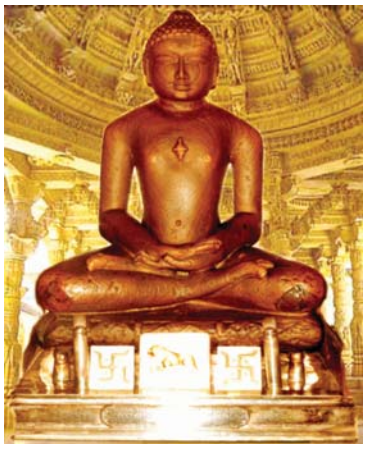

পার্শ্বনাথ এই চারটি নীতি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদের একসঙ্গে 'চতুর্যামব্রত' বলে। মহাবীর পরবর্তীতে আরও একটি নীতি যোগ করেন— ব্রহ্মচর্য নীতি। এই পাঁচটি নীতিকে একসঙ্গে 'পঞ্চমহাব্রত' বলে।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের শেষদিকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময়ে অনেক জৈন সন্ন্যাসী উত্তর ভারত ছেড়ে দক্ষিণে চলে যান। এই সময় থেকে জৈন ধর্মে দুটি ধারা বা অনুগামীর দুটি পৃথক দল তৈরি হয়— দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। যাঁরা পার্শ্বনাথের নির্দেশকে কঠোরভাবে মেনে চলতেন তাঁদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র। এঁরা উত্তর ভারতেই থেকে যান। এই জৈন সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠী শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হন। অন্যদিকে যে সকল সন্ন্যাসী দক্ষিণ ভারত চলে যান তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি মহাবীরের দেখানো পথকেই কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তিনিও বর্ধমান মহাবীরের মতো কোনও পোশাক পরতেন না। এই কারণে এঁদের নাম হয় দিগম্বর। ধীরে ধীরে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ বাড়তে থাকে। কিন্তু জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলোতে তাঁদের মধ্যে খুব একটা বিভেদ ছিল না। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট হয়ে যায়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | বাংলা

কুতুব মিনারের কথা

বিষয় সংক্ষেপ: 'কুতুব মিনারের কথা' গল্পটি সৈয়দ মুজতবা আলির লেখা। তিনি উপন্যাস, রম্যরচনা ছাড়াও ভ্রমণকাহিনি রচনায় অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই রচনাটিও সেরকমই একটি রচনা থেকে নেওয়া। প্রাবন্ধিক এখানে কুতুব মিনারের সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, কুতুব মিনারের মতো এত সুন্দর মিনার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তাঁর কথায় বার বার উঠে এসেছে মুগ্ধতা। বোঝা যাচ্ছে যে এই মিনারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এর সৌন্দর্য লেখককে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি জানিয়েছেন, এই কুতুব মিনারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলাউদ্দিন মিনার গড়ার চেষ্টা করেছেন যদিও তা শেষ অবধি হয়ে ওঠেনি।

লেখক পরিচিতি: সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪) বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ইত্যাদি লিখে তিনি বিখ্যাত হন। 'দেশে-বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'হিটলার', 'শবনম' ইত্যাদি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি 'নরসিংহদাস' সম্মানে ভূষিত হন।

নামকরণের সার্থকতা: ভ্রমণরসিক সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর রচনায় কুতুব মিনারের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা লেখকের চোখ দিয়ে যেন এই সৌন্দর্য অনুভব করতে পারি। সমস্ত রচনা জুড়ে এই প্রবন্ধে শুধু এই মিনার সংক্রান্ত আলোচনাই আমরা পেয়েছি। সুতরাং এই নামকরণ একদম সঠিক।

শব্দার্থ: মিনার - মোচার বা শঙ্খের মতো দেখতে চূড়া, সিক্রি - এখানে ফতেপুর সিক্রি, এক্সপেরিমেন্ট - পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মোগল কলা - মোগলদের শিল্পকলা, স্থপতি - স্তম্ভ, সৌধ বা ইমারত জাতীয় জিনিসকে বোঝায়, গুলদস্তাজ - মিনারেট জাতীয় ছোট চূড়া, আর্চ - খিলান, ছত্রি - ছাদ বা ছাতা, ছজ্জা - জানলা বা দরজায় ছাঁট আটকানোর জন্য ছাদের বর্ধিত অংশ, দার্ঢ্য - দৃঢ়তা, অপটিমাম সাইজ - সামঞ্জস্যপূর্ণ আকার, প্রপর্শন - সংগতি, ব্র্যাকেট - দেওয়ালের গায়ে আটকানো তাকের অংশ।

প্রশ্নোত্তর:

১) কুতুব মিনার নামটি কার নামানুসারে রাখা হয়েছিল?

উত্তর: ইতিহাস অনুসারে কুতুবুদ্দিন আইবকের নামানুসারে কুতুব মিনারের নামকরণ হয়। কারণ এই মিনার তৈরি করার পরিকল্পনা তাঁরই ছিল।

২) আহমেদাবাদ শহর কোন রাজ্যের রাজধানী এবং কোন রাজার নামানুসারে এর নামকরণ হয়?

উত্তর: আহমেদাবাদ গুজরাট-এর রাজধানী এবং রাজা আহমদের নামানুসারে এর নামকরণ হয়।

৩) কুতুব মিনারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য অপর কোন রাজা মিনার গড়তে চেয়েছিলেন?

উত্তর: আলাউদ্দিন খিলজি কুতুব মিনারের মতো মিনার গড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি আর হয়ে ওঠেনি।

৪) কোন সম্রাট অশোকস্তম্ভকে দিল্লি নিয়ে এসেছিলেন?

উত্তর: ফিরোজ শাহ তুঘলক অশোকস্তম্ভকে দিল্লি নিয়ে এসেছিলেন।

৫) মিনারেট বা মিনারিকা কী? মিনারের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় দেখাও?

উত্তর: মিনারেট হল ছোট স্তম্ভ বা মিনার। এর সঙ্গে মিনারের পার্থক্য হল এটি কোনও সৌধ বা মসজিদের অংশ হিসাবে থাকতে পারে বা না-ও থাকতে পারে অর্থাৎ মিনারেট কোনও ইমারতের অংশ হিসাবে থাকে একা থাকে না, তবে মিনার আপন সৌন্দর্যে নিজ মহিমায় দণ্ডায়মান, একে কোনও ইমারতের সাহায্য নিতে হয় না।

৬) কুতুব মিনারের ভাস্কর্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যে মিলন দেখা যায় তা বর্ণনা করো?

উত্তর: লেখকের বর্ণনা থেকে আমরা দেখি বাঁশি ও লতা-পাতা ও চক্রের নকশা সমস্ত মিনারের গায়ে খোদাই করা। যা হল হিন্দু দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। আবার মিনারের গায়ে খোদাই করা আরবি হরফও রয়েছে যা মুসলিম ধর্মের প্রতীক। এভাবেই আমরা দেখি হিন্দু-মুসলিম ধর্মের মিলন হয়েছে।

৭) কুতুব মিনারের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক আর কোন কোন মহৎ স্থাপত্যের উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: লেখক তাজমহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রির উল্লেখ করেছেন।

৮) লেখকের মতে কুতুব মিনার যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিনার, তার কতগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর: এই মিনারে পাঁচটি তলা আছে, প্রথম ও দ্বিতীয় তলা শুধু বাঁশি দিয়ে সাজানো, এখানে কতগুলি ব্যালকনি আছে, এছাড়াও লতা-পাতা-ফুল ও চক্রের নকশা আছে। এতে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখা যায়।

টীকা: কানিংহাম—কানিংহাম হলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি ঐতিহাসিক নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুতুবমিনার নিয়ে তাঁর রচনা।

ফার্গুসন— ফার্গুসনও একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি ইতিহাসের নানা বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন এবং প্রমাণও করেছেন।

সৈয়দ আহমেদ— সৈয়দ আহমেদ ছিলেন গুজরাটের রাজা। তাঁর নামানুসারে গুজরাটের রাজধানীর নাম হয় আমেদাবাদ। তিনি নিজের শিল্পজ্ঞান-এর দ্বারা এক মিনারিকা তৈরি করেন। গুজরাতের রাজবাড়ির মেয়েরা অলংকার পরতেন, মিনারিকার গায়ের কারুকার্যেও যেন সেই অলংকারই ফুটে উঠেছে।

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | ভূগোল

জলদূষণ

জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া এক মুহূর্ত আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এই জল নানা কারণে দূষিত হয়ে আমাদের জীবনে নানারকম ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সেই জলদূষণ ও তার প্রতিরোধ।

জলে নানারকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক, জীবাণু, জৈব পদার্থ মিশে যখন তা মানুষ ও পশুপাখির ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে ও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের অনোপযোগী হয়ে ওঠে, তখন জল দূষিত হয়।

ভারত নদীমাতৃক দেশ। সেই ভারতের প্রাণ গঙ্গা নদী গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন কারণে দূষিত হচ্ছে। এই নদীর দুই তীরে অসংখ্য কলকারখানা, শহর, নগর, জনবসতি, গড়ে ওঠার ফলে সেখানকার বিষাক্ত আবর্জনা নদীর জলে গিয়ে মিশে নদীর জলকে দূষিত করে তুলেছে। কাবেরী, গোদাবরী, যমুনা প্রভৃতি নদীগুলিরও একই অবস্থা। ভারতের মতো পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই যেমন আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চলে বিশুদ্ধ জলের সংকট দেখা গেছে। যার মূল কারণই হল জলদূষণ ও জলের অতিরিক্ত ব্যবহার। পৃথিবীর মোট ১০০ ভাগ জলের ৯৭ ভাগ সমুদ্রের নোনা জল। বাকি তিন ভাগ স্বাদু জলের দুই ভাগ হিমবাহের বরফ হিসাবে আছে, বাকি এক ভাগ স্বাদু জল নদী, জলাশয়, ও ভূ-গর্ভের জল। এর থেকে বোঝা যায় ব্যবহারযোগ্য জল কত দুর্লভ।

জলদূষণের কারণ:

১) **শিল্প কারখানা থেকে জলদূষণ:** পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প, পলিথিন-প্লাস্টিক শিল্প, জ্বালানি শিল্প, খনিজ তেল পরিশোধন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও বিভিন্ন যানবাহন নির্মাণ শিল্প কারখানা থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ যেমন—অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, ফেনল, সায়ানাইড, জিঙ্ক, পারদ, সিসা প্রভৃতি নালা, নর্দমা দিয়ে নদী বা সমুদ্রের জলে মিশে জলকে দূষিত করে।

২) **গৃহস্থালি থেকে জলদূষণ:** রোজকার জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন বস্তু যেমন রান্না করা খাবারের টুকরো, সাবান,

ফিনাইল নিকাশি নালার মাধ্যমে নদীর জলে মিশে জলকে দূষিত করে তোলে।

৩) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে দূষণ:** পারমাণবিক চুল্লি, চিকিৎসাকেন্দ্র বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি ব্যবহারের পর সমুদ্রে বা নদীতে ফেলা হয়, যা জলকে দূষিত করে।

৪) **খনিজ তেল থেকে দূষণ:** অনেক সময় দেখা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্থ তেলবাহী জাহাজ থেকে বা সমুদ্রে অবস্থিত তেলের খনির তেল সমুদ্রের জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়।

৫) **কৃষিক্ষেত্র থেকে দূষণ:** চাষের জমিতে যে সমস্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় সেগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে ভূ-গর্ভের জলে, জলাশয়ে, নদীতে মিশে জলকে দূষিত করে।

৬) **তাপীয় দূষণ:** তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উষ্ণ, দূষিত বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে-জলাশয়ে মিশে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে জলদূষণ ঘটায়।

৭) **বায়ুদূষণের কারণে জলদূষণ:** কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়ার মাধ্যমে বাতাসে সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড জমা হয়। পরে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে অ্যাসিড হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের জলকে দূষিত করে।

৮) **আর্সেনিক দূষণ:** মাটির নীচের জলস্তর কমে গেলে ফাঁকা অংশে আর্সেনিক বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরি করে। এই যৌগ নলকূপের জলের মাধ্যমে পানীয় জলে মিশে জলকে দূষিত করে।

জলদূষণের কারণে হওয়া কিছু দুর্ঘটনা:

১৯৩২ সালে জাপানে মিনামাটা উপসাগরের উপকূলে একটি রংয়ের কারখানা থেকে পারদযুক্ত তরল বর্জ্য সমুদ্রে ফেলার ফলে পারদ দূষণে অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তু মারা যায়।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কুয়েতে প্রচুর তেলের কূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তার ফলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল সমুদ্রের জলে মিশে জলকে দূষিত করে এবং অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মালদা, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার মাটির তলায় অতিমাত্রায় আর্সেনিক থাকার ফলে সেখানকার মানুষের হাতের চেটো ও পায়ের তলায় কালো একধরনের ক্ষত দেখা যায় যাকে 'ব্ল্যাকফুট' ব্যাধি বলে। এছাড়াও ত্বকের ক্যানসার, চর্মরোগ, রক্তাল্পতা হতে পারে। ফ্লুরাইড দূষণ থেকে ফ্লুরোসিসও হতে পারে।

জলদূষণ প্রতিরোধ

জলের অপচয় রোধ করে জলদূষণ কমানোর দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত, তা না হলে পৃথিবীব্যাপী মানুষকে তীব্র জলসংকটের সম্মুখীন হতে হবে। যে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে তা হল—

নদী বা সমুদ্রের জলে আবর্জনা না ফেলা, কাপড় কাচা, জীবজন্তু স্নান না করানো, শহর ও কলকারখানার দূষিত জল শোধন করে তবেই নদী বা সমুদ্রে ফেলা বা পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, চাষের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা, তাপবিদ্যুৎ বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য উষ্ণ জল ঠান্ডা করে তবেই সমুদ্র বা নদীতে ফেলা, নলকূপের জলের দূষণ রোধ করার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে তবেই তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

বিজ্ঞানীদের মজার তথ্য

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

তাঁর জীবনে নিজের কাজের সঙ্গে সবথেকে আপন ছিল লিনা। আইনস্টাইনের বউ, ছেলে কারওর সঙ্গেই সারা জীবন মধুর সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু লিনা, যেটা তাঁর সাধের ভায়োলিন, তাকে তিনি কখনও কাছছাড়া করেননি। আর সবথেকে অপ্রিয় ছিল চুল কাটা।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

বিজ্ঞানীদের মজার তথ্য

থমাস আলভা এডিসন

নিজের আবিষ্কৃত প্রায় ১০০০টা জিনিসের পেটেন্ট ভোগ করা এই বিজ্ঞানী ৯ বছর বয়স থেকেই হাতখরচের টাকা দিয়ে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ কিনতেন। এগুলো তাঁর কাছে ছিল অমূল্য। কেউ যাতে হাত না দেয় তাই তিনি শিশিগুলোতে 'বিষ'-বলে লেবেল সেঁটে রাখতেন। দশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ল্যাবরেটরি তৈরি করেন।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | ইংরেজি

The Sea দ্য সি (সমুদ্র)

আজ আমাদের পাঠ্য 'দ্য সি' কবিতাটি। জেমস রিভস (১৯০৯-১৯৭৮)-এর লেখা এই কবিতাটি পাঠকদের খুব প্রিয়। সমুদ্রের বিভিন্ন রূপকে তিনি কুকুরের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তুলনা করে আকর্ষণীয় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ব্রিটিশ কবি নাটক, কবিতা, সাহিত্যের সমালোচনা ইত্যাদি নানান কাজ করেছেন। 'দ্য সি' পড়লেই বোঝা যায় যে ছোটদের লেখায় তিনি সবথেকে বেশি নজর কেড়েছেন। বলা হয় ডি লা মেয়ারের পর রিভস-ই বাচ্চাদের জন্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সুন্দর কবিতা লিখে গিয়েছেন।

এই কবিতায় তিনটি অনুচ্ছেদে সমুদ্রের তিন রকম রূপের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে দিনের সমুদ্র একটি হিংস্র, ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো উত্তাল। দ্বিতীয় দিনে রাতের সমুদ্র পাহারাদার কুকুরের মতো। সে লম্বা, তীক্ষ্ণ ডাক দেয় আর নিজের গা ঘষতে থাকে। আবার মে, জুন মাসের সমুদ্রের যে শান্ত রূপ তা এক ঘুমন্ত কুকুরের মতো, যে নিস্তব্ধে দুটো থাবার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

একটা দৈত্যের মতো আকৃতির ধূসর রঙের ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন দৌড়ে বেড়ায়, আর নিজের কর্কশ দাঁত আর থাবা দিয়ে কড়মড়িয়ে হাড়ের পর হাড় চিবাতে থাকে তেমনি সমুদ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার তীরে ঢেউ এর পর ঢেউ নিয়ে গড়িয়ে পড়ে, আছড়ে পড়ে আর ডিগবাজি খাওয়া পাথরগুলোকে গুড়গুড় শব্দে ভাঙতে থাকে। সে যেন গোঙাতে থাকে আর চেটে চেটে নিজের থাবা পরিষ্কার করতে থাকে।

রাত্রি বেলায় ঝোড়ো বাতাসে চাঁদ যখন কালো মেঘে দোলা খেতে থাকে সমুদ্র জোয়ারে ফুলে ফেঁপে ওঠে। কুকুর যেমন ফোঁস-ফোঁস করে গন্ধ শুঁকে কিছু খুঁজতে থাকে সমুদ্রও যেন ফোঁস-ফোঁস করতে থাকে। কুকুর যেভাবে ভিজে গা ঝাঁকিয়ে সব জল ঝেড়ে ফেলে তেমনি সমুদ্রের ঢেউ পাশের খাঁড়িগুলোকে ছাপিয়ে নিজের গা ঝাড়া দেয়। কুকুরের ডাকের মতোই সমুদ্রের গর্জন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

সবশেষে সমুদ্রের শান্ত রূপের কথা আছে। মে-জুন মাসে যখন প্রকৃতি এতটাই শান্ত থাকে যে বালিয়াড়ির ওপরে বাতাসে ঘাসের দোলায় তৈরি হওয়া শব্দও শোনা যায় না তখন সমুদ্রও কুকুরের মতো থাবায় মুখ লুকিয়ে ঘুমায়।

শব্দার্থ: rolls (রোলস)-গড়াগড়ি খায়, beach (বিচ)-সমুদ্র তট, clashing (ক্ল্যাশিং)-পরস্পর বিরোধী, rumbling (রাম্বলিং)-গুড়গুড় শব্দ করে, tumbling (টাম্বলিং)-ডিগবাজি দেওয়া, greasy (গ্রিজি)-নোংরা, roars (রোরস)-গর্জন করে, snuffs (স্নাফস)-নস্যি, sniffs (স্নিফস)-জোরে শ্বাস ছাড়া, howls (হাউলস)-কুকুরের মতো বিশেষ আওয়াজে আর্তনাদ করা, dune (ডিউন)-বালিয়াড়ি, reedy (রিডি) যেমন হারমনিয়াম বা পিয়ানোর রিড, paws (পস)-থাবা, sandy (স্যান্ডি)-বালিময়, shore (শোর)-সমুদ্র তীর, scarcely (স্কার্সলি) খুব কম।

1) Fill in the blanks with correct word or words.

a. The sea is compared to a hungry dog.

b. The sea rolls on the beach all day.

c. The sea remains quiet in May and June.

d. The sea looks grey when it is like a hungry dog.

2) Answer the following questions:

a. Who rocks in the stormy cloud?

Ans. The moon rocks in the stormy cloud.

b. Where does the sea shake his wet sides like a dog?

Ans. The sea shakes his wet sides to the cliffs like a dog.

c. How are the grasses on dune in May or June?

Ans. The grasses on dune in May or June do not play their reedy tunes. That means they remain quiet.

d. What are compared with the bones?

Ans. The rumbling, tumbling stones are compared with the bones.

e. When does the sea moan?

Ans. The sea moans like a dog when it licks its greasy paws.

f. How does the sea dog sleep on the sands?

Ans. Sea sleeps as a dog sleeps hiding its head between the paws. It also makes sounds like snoring.

3) Read the following sentences and separate the principle clauses and dependent clauses.

a. I know a man who is a doctor.

I know a man. (p.c.) / Who is a doctor.(d.c.)

b. Tell me who opened the door.

Tell me. (p.c.) / Who opened the door. (d.c.)

c. She is the student who always stands first in the class.

She is the student. (p.c.) / Who always stands first in the class. (d.c.)

ক্লাস এইট-এর টিউশন | বিজ্ঞান

পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

সমস্ত বস্তুই কোনও না কোনও পদার্থ দিয়ে তৈরি। পদার্থের ভর, ওজন আছে, আয়তন আছে, একে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় এবং এর স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলে বাধা দেয় অর্থাৎ জাড্যধর্ম বর্তমান।

ভৌত অবস্থা অনুযায়ী তিন প্রকারের পদার্থ দেখা যায়—কঠিন (যেমন, লোহা, কাঠ, বরফ, কয়লা, চুনা পাথর ইত্যাদি), তরল (যেমন, জল, তেল, গ্লিসারিন, কেরোসিন, দুধ, পেট্রোল ইত্যাদি) এবং গ্যাসীয় পদার্থ (যেমন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি)। প্রধানত পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণের তারতম্যের কারণেই পদার্থের তিন রকম অবস্থা দেখা যায়।

তাপের প্রভাবে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন জলের কঠিন অবস্থা হল বরফ। তাপের প্রভাবে বরফ গলে তরল জলে পরিণত হয়। আরও তাপের প্রভাবে জল গ্যাসীয় বাষ্পে পরিণত হয়।

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক: নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটি বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থ যে তাপমাত্রায় গলে তরলে পরিণত হয়, তাকে ওই কঠিনের গলনাঙ্ক বলে। আবার নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটি বিশুদ্ধ তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করে গ্যাসে পরিণত হয় তাকে ওই তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে। নীচে তালিকা করে কয়েকটি পদার্থের প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া হল।

পদার্থের ধর্ম: আমাদের চারপাশের অসংখ্য কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রতিটির ধর্ম অন্যটির থেকে আলাদা। প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যর জন্যে একটি পদার্থকে অন্য আর একটি পদার্থ থেকে আলাদা করে চেনা যায়, পদার্থের সেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে পদার্থের ধর্ম বলে।

পদার্থের ধর্মগুলো প্রধানত দুই প্রকার:

ক) **ভৌত ধর্ম:** পদার্থের যেসব বিশেষ বাহ্যিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে তাদের ভৌত ধর্ম বলে। যেমন, ভৌত অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, চৌম্বক ধর্ম, দ্রাব্যতা, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ইত্যাদি। এই ধর্মগুলোর দ্বারা শুধুমাত্র পদার্থের বাহ্যিক অবস্থার ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, পদার্থটির অভ্যন্তরীণ আণবিক গঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পদার্থটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না তা এই ধর্ম দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। পদার্থের এই ধর্মগুলিকেই বলে পদার্থের ভৌত ধর্ম।

বিভিন্ন পদার্থকে তাদের কিছু বাহ্যিক ধর্মের জন্যে আলাদা করে চেনা যায়। গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, চৌম্বক ধর্ম দিয়ে বিভিন্ন পদার্থকে চেনা যায়। যেমন, লোহা আর কাঠের টুকরোর স্পর্শ আলাদা। আবার অ্যামোনিয়ার গন্ধ ঝাঁঝালো,

আর হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের মতো। চিনি, নুন জলে দ্রবীভূত হয় কিন্তু কেরোসিনে দ্রবীভূত হয় না। অন্যদিকে কর্পূর কেরোসিনে সহজেই দ্রবীভূত হয়।

লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা গেলেও কাঠের টুকরোকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না। আবার বলা যায় লোহাকে চুম্বক আকর্ষণ করে কিন্তু কাঠকে করে না।

খ) **রাসায়নিক ধর্ম:** পদার্থের যে ধর্ম পদার্থটির অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রবণতা ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে পদার্থটির রাসায়নিক ধর্ম বলে।

যেমন তড়িৎ প্রবাহের ফলে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়, এটি জলের রাসায়নিক ধর্ম। আবার সালফারকে বাতাসে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটি সালফারের রাসায়নিক ধর্ম। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে জিংক ধাতুর টুকরোর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়, এটি জিংকের রাসায়নিক ধর্ম।

অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন আসে। তার থেকে পদার্থের শনাক্তকরণ সম্ভব। যেমন, নুন আর চিনি এক রকমের দেখতে। তাদের ভৌত ধর্ম স্বাদ দিয়ে তাদের শনাক্তকরণ সম্ভব। কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম দিয়ে শনাক্ত করতে চাইলে দুটো পদার্থকে আলাদা আলাদা ভাবে উত্তপ্ত করলে দেখা যাবে চিনি বাদামি রঙ ও আরও উত্তাপে কালো হয়ে যাবে আর নুনে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। একটু জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারে।

কঠিন পদার্থ	গলনাঙ্ক (°C)	তরল পদার্থ	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
বরফ	০	জল	১০০
খাদ্যলবণ	৮০১	পারদ	৩৫৭
অ্যালুমিনিয়াম	৬৫৯	ক্লোরোফর্ম	৬১
তামা	১০৮৩	ইথাইল অ্যালকোহল	৭৮
সোনা	১০৬৩	ইথার	৩৫
রুপো	৯৬২	বেঞ্জিন	৮০.১
জিংক	৪২০	অ্যাসিটোন	৫৬
লোহা	১৫৩০	সালফিউরিক অ্যাসিড	৩৩৮

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ইতিহাস

বাস্তিলের পতন

এই টিউশনে আজ আমরা স্টেটস জেনারেল নিয়ে রাজার সঙ্গে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনদের সংঘাত নিয়ে আলোচনা করব।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে দীর্ঘ ১৭৫ বছর পর দেশের অর্থসংকট মেটাতে ও অভিজাতদের চাপে ষোড়শ লুই ফরাসি জাতীয়সভার অধিবেশন স্টেটস জেনারেল-এর অধিবেশন ডাকেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, এই সভায় যাজক (৩০৮ জন), অভিজাত (২৮৫ জন) ও তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ (৬২১ জন) অংশ গ্রহণ করেছিল। ভোটব্যবস্থাও ছিল সম্প্রদায় পিছু, মাথা পিছু না। যাজক আর অভিজাতরা মিলিত ভাবে ভোট দিত দুটি, আর তৃতীয় সম্প্রদায় মিলে ভোট দিত একটি। প্রত্যেকবার এই ভোটে প্রথম দুই শ্রেণির জয় হতো। তাই এই অধিবেশনে তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ফ্রান্সের জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব বাঁধে। তাদের দাবি ছিল তাদের এক কক্ষে বসতে দিতে হবে এবং মাথা পিছু ভোটের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এদের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিরাব্যুঁ, লাফায়ে, আবেসিয়েস, রোবসপিয় প্রমুখ। যথারীতি রাজা ষোড়শ লুই, যাজক ও অভিজাতরা এই দাবি মানতে চাননি। এই তৃতীয় সম্প্রদায় বিপ্লবাত্মক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে জাতীয় সভা ঘোষণা করে যা ছিল আইন বিরোধী। ফলে রাজা তা মানেননি।

টেনিস কোর্টের শপথ: ১৭৮৯ সালের ২০ জুন তৃতীয় সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট ঘরে সভার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু রাজা সেই কক্ষ বন্ধ করে রাখেন সভা ভেস্তে দেওয়ার জন্য। এতে ক্ষুব্ধ জনগণ মিরাব্যুঁ ও অ্যাবসিয়েসেয়ার নেতৃত্বে এক টেনিস মাঠে জমায়েত হয়ে শপথ নেন যে ফ্রান্সের নতুন সংবিধানে তাদের অধিবেশনের কথা উল্লেখ করতে হবে এবং তারা যে স্থানেই সভা করুক না কেন, তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এই শপথ 'টেনিস কোর্টের শপথ' বলে বিখ্যাত। ১৩৯জন যাজকের মধ্যে ৪৭জন এই আন্দোলনে সামিল হন। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে রাজা সব দাবি মেনে নেন।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ফল বস্তিল দুর্গের পতন: বাস্তিল দুর্গ ছিল এমন এক কারাগার যেখানে নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেওয়া হতো। রাজা ষোড়শ লুই বুর্জোয়াদের দাবি মেনে নেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের দাবিয়ে রাখার জন্য তিনি প্যারিস ও ভার্সাই-এ সৈন্য মোতায়েন করেন আর জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করেন। এতে অসন্তোষ আরও বাড়ে। আশেপাশের গ্রামের মানুষ প্যারিসে এসে বিদ্রোহে যোগ দেন। সর্বহারা মানুষরা অস্ত্রের দোকান লুট করে ব্যারিকেড করে এবং এই সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে বন্দিদের মুক্ত করে। এই দুর্গ ছিল রাজার স্বৈরাচারিতার চরম নিদর্শন। এর পতনে অভিজাতরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের দিন শেষ। প্যারিসের শাসনভার বুর্জোয়ারা নিজের হাতে তুলে নেন। তারা প্যারিস কমিউন গঠন করে পৌর শাসনব্যবস্থা চালু করে, এতে প্যারিসের শাসনব্যবস্থা নতুন করে গঠিত হয় এবং লাফায়েতের নেতৃত্বে নতুন জাতীয় রক্ষাবাহিনী গঠিত হয়। ফ্রান্সও এর দেখাদেখি ফ্রেঞ্চ কমিউন গঠন করে। ইতিহাসে এই বিপ্লব এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। ঐতিহাসিক গুডউইন তাঁর ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন গ্রন্থে বলেছেন, বিপ্লবে বাস্তিলের পতনের মতো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা আর ঘটেনি। এই প্রতিবাদ ইঙ্গিত দেয় যে রাজার একক শাসন আর কার্যকরী নয়। রাজা বুঝতে পারেন প্যারিসে তাঁর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

প্যারি কমিউন: প্যারিস নগরী বরাবরই বিদ্রোহের জন্য ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে। এখানে প্রজাতন্ত্রের একাধিপত্য ছিল। তাদের ধারণা ছিল প্যারিসই ফ্রান্সের যোগ্য রাজধানী। কিন্তু সরকার ভার্সাই শহরকে রাজধানী বানালে প্যারিসের আত্মসম্মানে লাগে, তারা ভয় পায় রাজতন্ত্রবাদী ভার্সাইদের জন্যে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র না ফিরে আসে। জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যারিসের প্রতিটি মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে প্যারিস হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্যারিস বঞ্চিত হয় রাজধানী হওয়ার থেকে। এতে প্যারিসের ব্যবসায়ীদের ভয় হয় যে ভার্সাইদের সঙ্গে পাল্লায় তাঁরা পারবেন না। ফলে তাঁরা সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা না রেখে তা ভাগ করে দিতে চান। তাঁরা দাবি করেন প্রতি অঞ্চলে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে যাদের নিয়ে কমিউন গঠন করা হবে। এঁরা স্থানীয় শাসন দেখাশোনা করবেন। এই কমিউনের প্রতিনিধি সরকার গঠন করবেন। ৯০জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রথমবার এই প্যারি কমিউন গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতি থ্রিয়ার্স প্রথম জাতিকে আশ্বস্ত করেন যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয়েছে। প্যারি কমিউনের বিদ্রোহ দমন না করা হলে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য ভেঙে পরবে। পরে তিনি সেনাপতি ম্যাকমেহনকে নিয়োগ করেন বিদ্রোহ দমন করার জন্য। তিন সপ্তাহের যুদ্ধে তিনি প্যারিস কবজা করেন। শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের দমন করে বুর্জোয়াদের জয় হয়।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | বাংলা

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এই কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের এক নৃশংস সামাজিক অবস্থায় রবি ঠাকুরকে স্মরণ করে শান্তি পেতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ঘা তখনও শোকায়নি, মানুষ তখনও ভীত, সন্ত্রস্ত। এরকম করুণ সময়ে রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে তিনি শান্তির বাণী শোনাতে চেয়েছেন। কবি তাঁর যৌবনের দিনগুলি দুর্ভিক্ষের খিদের জ্বালা নিয়ে কাটিয়েছেন। কবিতার শেষে কবির হতাশা প্রকাশ পেয়েছে, কবি বলেছেন সাম্রাজ্যবাদী অসুরের কাছে শান্তির বাণী শোনানো ব্যর্থ। তিনি বলেছেন যখন প্রতিটি মানুষ ঘরে ঘরে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবে তখনি হবে আসল যুদ্ধ। এভাবেই কবি এক অস্থির সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাই কবিতার নামকরণও যথার্থ হয়েছে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনাসম্ভারে কবিতা, ছোটগল্প, নাটিকা, গান সবই ছিল। তিনি সাম্যবাদী, বিপ্লবী কবি রূপে পরিচিত। 'দেশলাই কাঠি', 'কলম', 'আগামী কবিতা'য় তাঁর বিপ্লবী রূপ প্রকাশ পায়।

শব্দার্থ: নিভৃত - গোপন, ভ্রুকুটি - ভ্রু-ভঙ্গিতে ইশারা, স্বগত - আত্মগত, বিনিদ্র - নিদ্রাহীন, সাইরেন - বিপদের সংকেত, ললিত বাণী - কোমল বাক্য।

টীকা: **দুর্ভিক্ষের কবি**— কবি সুকান্ত নিজেকে নিজেই দুর্ভিক্ষের কবি বলেছেন। কবি তাঁর জীবনের শেষভাগে এসে দেখেছেন ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। মানুষের হাহাকার কবির মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি যৌবনের আনন্দময় দিনগুলো কাটিয়েছেন দুর্ভিক্ষের পেটের জ্বালা সহ্য করে, তাই তিনি নিজেকে বলেছেন দুর্ভিক্ষের কবি।

জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি— জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি বলতে কবি খিদের জ্বালাকে বুঝিয়েছেন। কবি তাঁর জীবনের শেষ দশায় দুর্ভিক্ষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দেশের সব মানুষের খিদের হাহাকার তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর চোখের সামনে বহু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন এই কথাটি।

দানবের সাথে সংগ্রাম— রবীন্দ্রনাথের মতো কবি সুকান্তও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস', সেইরকম সুকান্ত বলেছেন 'দানবের সাথে সংগ্রাম'। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কবি বুঝেছেন এই দানবের সাথে লড়াই করার জন্য ঘরে ঘরে মানুষকে প্রস্তুত হতে হবে।

সতর্ক সাইরেন— রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতায় কবির রচনার প্রেক্ষাপট হল যুদ্ধের। যুদ্ধের সময়ের সাইরেন কবির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। যুদ্ধের সময় সাইরেনের কাজই হল মানুষকে বিপদের সংকেত দেওয়া। সাইরেনের কথা উল্লেখ করে তিনি সেই সময়ের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিকে বোঝাতে চেয়েছেন।

১) 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় অপর কোন কবির কোন কোন পংক্তির উল্লেখ আছে?

উত্তর: কবি সুকান্ত রবি ঠাকুরের 'প্রান্তিক' কাব্যের অষ্টাদশ সংখ্যক কবিতার একটি লাইন তুলেছেন, 'শান্তির ললিত বাণী —শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।'

২) 'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে'-এই প্রস্তুতি কীসের?

উত্তর: 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দানব তাঁর সমাজকে গ্রাস করছে। তবে কবি আশার আলো দেখেছেন, তিনি বলেছেন বাংলার ঘরে ঘরে মানুষ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন।

৩) 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি নিজেকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন?

উত্তর: কবি এই কবিতায় নিজেকে বলেছেন দুর্ভিক্ষের কবি।

৪) 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি'—কবি কেন নিজেকে এরকম বলেছেন? কবিতার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করো?

উত্তর: কবি যে সময় এই কবিতা রচনা করেছেন সেই সময় দুর্ভিক্ষের ক্ষত কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের কালোবাজারি মুনাফালোভীর দল ফসল সংরক্ষণ করে সমাজে যে হাহাকার এনে দিয়েছে কবি তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। চারিদিকে মানুষ অনাহারে মারা গেছে এবং তাদের মৃতদেহ পশুতে ছিঁড়ে খেয়েছে— এই সব দৃশ্য কবির যৌবনের দিনগুলিতে স্বপ্ন দেখিয়েছে 'মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবির'। এই প্রেক্ষাপটে কবি নিজেকে দুর্ভিক্ষের কবি বলেছেন।

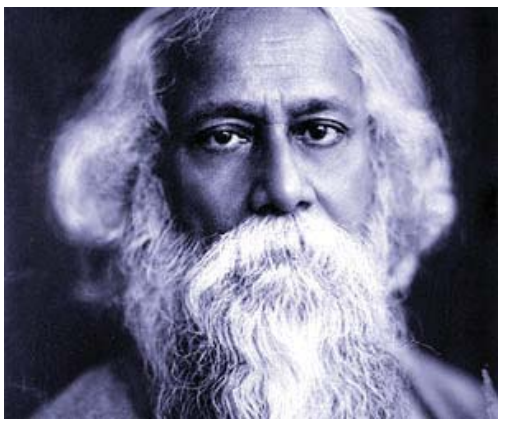

৫) 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়'—কেন কবির বসন্ত কেটেছে খাদ্যের সারিতে?

উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কালোবাজারির ফলে বাংলার মানুষ যে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল কবিও তাঁর মধ্যে ছিলেন। তিনি তাঁর যৌবনের বসন্ত কাটিয়েছেন ভাতের লাইনে পেটের খিদে মেটানোর তাগিদে। সেই কথা স্মরণ করেই কবি এই কথা বলেছেন।

৬) 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'—'শান্তির ললিত বাণী' কথাটির অর্থ কী? কবি কেন একে 'পরিহাস' বলেছেন?

উত্তর: উপরিউক্ত লাইনটির অর্থ হল 'শান্তির বাণী' এখন হয়ে গেছে ব্যর্থতার পরিহাস। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার অরাজকতার কথা বলতে গিয়ে এই উক্তি করেছেন। কবি সুকান্ত যে সময় এই কবিতাটি লিখেছেন সেই সময়ও এই রকমই অরাজকতা। তাই রবি ঠাকুরের এই উক্তিকে তিনি স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে শান্তির বাণী মানুষকে শান্তি দিতে পারবে না, তা উপহাস মনে হবে। কারণ সবাই জানে এই বাণী ব্যর্থ।

বিজ্ঞানীদের মজার তথ্য

গ্যালিলিও গ্যালিলি

আইনস্টাইন এঁকে আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক বলেছেন। কিন্তু গ্যালিলিও বেশ কিছু রোজকার ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস বানাতে বিফল হন, যেমন, টমেটো তোলার অটোমেটিক যন্ত্র, পকেট চিরুনি, বল পয়েন্ট পেন ইত্যাদি।

মাদাম ক্যুরি

মাদাম ক্যুরি বিজ্ঞান আর অঙ্ককে সবথেকে বেশি ভালোবাসতেন। টাকার প্রয়োজনে তিনি কলেজে ল্যাবরেটরির কাচের জিনিস পরিষ্কারের কাজ নেন। যাতে তিনি তাঁর ভালোলাগার জগতেই থাকতে পারেন।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ শুরু হবে একটি নতুন বিভাগ '**আমি ও আমার স্কুল**'। এই বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMI O AAMAR SCHOOL'

মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

মেল করার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে নীচের নম্বরে ফোন করতে পারো: **শর্মিলাদি** (কলকাতা ও শিলিগুড়ি সংস্করণ) 9231914537 এবং **এনায়তিদি** (শিলচর, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড় সংস্করণ) 8486581362

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ভূগোল

বায়ুমণ্ডল

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত যে গ্যাসের আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

বায়ুমণ্ডল একটি যৌগিক মিশ্রণ। এতে তিনটি উপাদান থাকে।

গ্যাস: বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন (৭৮.১%) ও অক্সিজেন (২০.৯%) বায়ুমণ্ডলের ৯৯% দখল করে রেখেছে। বাকি ১ ভাগে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন, মিথেন প্রভৃতি।

১) **নাইট্রোজেন:** নাইট্রোজেন গ্যাস প্রাণিজগতকে পরোক্ষভাবে উপকৃত করে। মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নিয়ে মাটিতে মিশিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

২) **অক্সিজেন:** অক্সিজেন প্রাণিজগতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস। এছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এটি রাসায়নিক আবহবিকার ঘটাতেও সাহায্য করে।

৩) **কার্বন-ডাই-অক্সাইড:** বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সবথেকে কম কিন্তু এর প্রভাব উদ্ভিদ জগতের উপর সবথেকে বেশি। কারণ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের জন্যে বায়ু থেকে এই গ্যাস গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে এই গ্যাসের পরিমাণ বেশি সেখানে গরমও বেশি। এই গ্যাস বৃষ্টির সাথে মিশে চুনজাতীয় শিলায় রাসায়নিক আবহবিকার ঘটায়।

৪) **ওজোন গ্যাস:** স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ২৫-৪০ কিমি জুড়ে আছে এই গ্যাস যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। এই রশ্মি প্রাণিজগতের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এই গ্যাস জীবকূলকে রক্ষা করছে। তবে এই স্তর নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

জলীয়বাষ্প: বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ খুব কম (১.৪%)। ৯০% জলীয়বাষ্পই বায়ুর নীচের স্তরে থাকে।

জলীয়বাষ্পের জন্যই পৃথিবীতে মেঘ, শিশির, কুয়াশা, বৃষ্টি হয়। জলীয়বাষ্পের তারতম্যে বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। জলীয়বাষ্পের লীনতাপ বায়ুমণ্ডলের শক্তির উৎস। এই জলীয়বাষ্পের উপর বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণ নির্ভর করে।

ধূলিকণা: বায়ুমণ্ডলের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ধূলিকণা বা এরোসোল। বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে অবস্থিত ধূলিকণা, ছাই, ভস্ম, লবণ, কয়লা এদেরই বলে এরোসোল। aero মানে বাতাস sol মানে কণা।

ধূলিকণা সূর্যতাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এর সাহায্যে আকাশে রামধনু সৃষ্টি হয় ও সূর্যরশ্মির সামান্য অংশ প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। ধূলিকণা জলীয়বাষ্পকে ঘনীভূত করে মেঘ ও কুয়াশার সৃষ্টি করে।

উপাদান ও উষ্ণতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস:

বায়ুমণ্ডলের স্তরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১) উপাদান বা রাসায়নিক গঠন অনুসারে স্তরবিন্যাস:

হোমোস্ফিয়ার: হোমো মানে সম, স্ফিয়ার মানে অঞ্চল। ভূপৃষ্ঠের ৯০ কিমি জুড়ে বায়ুমণ্ডলের উপাদানের অনুপাত মোটামুটি একই ধরনের থাকে তাই একে বলে হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল। একে চার ভাগে ভাগ করা যায়— ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার।

হেটেরোস্ফিয়ার: হেটেরো মানে বিষম। এই মণ্ডলে বায়ুর গঠনগত উপাদানগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ৯০-১০,০০০ কিমি জুড়ে এর বিস্তার। একে চার ভাগে ভাগ করা হয়—আণবিক নাইট্রোজেন স্তর, পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর, হিলিয়াম স্তর, হাইড্রোজেন স্তর।

২) উচ্চতা ও উষ্ণতার ভিত্তিতে:

ট্রপোস্ফিয়ার: ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৭ কিমি এবং মেরু অঞ্চলে ৮ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলে। এর গড় উচ্চতা ধরা হয় ১২ কিমি, এই স্তরে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস থাকে। প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬.৪ ডিগ্রি হারে এখানে উষ্ণতা কমে, এই স্তরে ঝড়-বৃষ্টি হয় বলে একে ক্ষুব্ধমণ্ডল বলে। মধ্য অক্ষাংশে এর উষ্ণতা প্রায় -৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার: ট্রপোস্ফিয়ারের পরে ১২-৫০ কিমি জুড়ে এই স্তর অবস্থিত। এই দুই স্তরের সংযোগ স্থলের ১ কিমি স্থানকে ট্রপোপজ বলে। এই স্তর শান্ত ও মেঘহীন। জেট বিমানগুলি এখান দিয়ে চলাচল করে। ওজোন গ্যাস এই স্তরে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।

মেসোস্ফিয়ার: স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরে ৫০ কিমি পর্যন্ত স্তরকে মেসোস্ফিয়ার বলে আর এই দুই স্তরের সংযোগস্থলকে বলে স্ট্রাপোপজ। এখানে উষ্ণতা -৮৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে কমতে থাকে তাই এটি খুব শীতল ও কম বায়ুচাপ যুক্ত হয়। এখানে উল্কাপিণ্ড ছাই হয় এবং অধিক উচ্চতায় জলীয়বাষ্প ও হালকা মেঘ দেখা যায়।

আয়নোস্ফিয়ার: মাটি থেকে ৮০-৪৮০ কিমি উচ্চতাবিশিষ্ট স্তরকে থার্মোস্ফিয়ার বলে। এর নিম্নাংশ হল আয়নোস্ফিয়ার। অত্যধিক উষ্ণতার জন্য তাপ বিকিরণের ফলে সূর্যাস্তের পর মেরুজ্যোতি দেখা যায়। বেতার তরঙ্গ এই স্তরকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এর মূল আণবিক উপাদান নাইট্রোজেন ও পারমাণবিক শক্তি। ইলেকট্রনের ঘনত্বের ভিত্তিতে এই স্তরকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়।

এক্সোস্ফিয়ার: থার্মোস্ফিয়ারের উপরে ৫০০-৭০০ কিমি পর্যন্ত এই স্তর। এখানে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি। এখানে উচ্চতার সঙ্গে উষ্ণতা কমতে থাকে।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার: একদম শেষের স্তর হল এটি। এখানে ইলেকট্রন ও প্রোটন বেশি। এখানে সৌরবায়ু ধরা পড়ে। এখানে পৃথিবীর চৌম্বকীয় বল থেমে যায় যাকে ম্যাগনেটোপজ বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই স্তর ঘন বলয় হিসাবে অবস্থান করে যাকে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ স্তর বলে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ইংরেজি

The Cat দ্য ক্যাট (বিড়ালটি)

আজ আমাদের পাঠ্য একটি ছোট গদ্য রচনা। বিড়াল প্রাণীটির কার্যকলাপ, ভাবনা-চিন্তা তার দিনযাপনকে লেখক একটি বিড়ালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বর্ণনা করেছেন। এর ফলে বিষয়বস্তু বেশ মজার হয়েছে। ব্যঙ্গরস ব্যবহার করে লেখক বিড়াল প্রাণীটিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ, রাশভারী রূপ দিয়েছেন।

লেখক অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন (১৮৬৪-১৯৪১) একজন অস্ট্রেলিয়ান কবি, সাংবাদিক এবং লেখক। তাঁর দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'ওয়াল্টজিং মাটিলডা' এবং 'দ্য ম্যান ফ্রম স্নোয়ি রিভার'।

লেখাটা শুরু হয়েছে বিড়াল নিয়ে আমাদের যে ধারণা তাই দিয়ে বেশির ভাগ লোকই বিড়ালকে নির্বোধ, মাখনপ্রিয়, ইঁদুর আর দুধ খাওয়া প্রাণী বলেই জানে। এই আপাত নিরীহ প্রাণীটি যে মোটেই গো-বেচারা নয়, তা লেখক কৌতুকভরে দেখিয়েছেন। কীভাবে বিড়াল অতিথির কাছ থেকে সেরা খাবারগুলো আদায় করে, না পেলে একটু বুদ্ধি করে জোর খাটায়, খাবার আদায় করে আবার মারের ভয়ে সুবিধাজনক দূরত্বে গিয়ে আরাম করে সেই খাবারের স্বাদ নেয়। সে বুদ্ধিহীন নয় তাই খাবার আদায়ের কৌশল জানে আবার নিজেকে নিরাপদ রাখতেও জানে। এমনকী তাদের বিনোদনের অনেক কৌশল আছে। একটা বিড়াল নিজের একঘেয়েমি কাটাতে ইঁদুর খোঁজে, শিকার করে। তারা পাড়া-ভ্রমণে বার হয়। এমন সব অন্ধকার কোণ তাদের বিচরণ ক্ষেত্র, যেখানে মানুষও সচরাচর যায় না। আবার বয়স বাড়লে তাদের বীরত্ব রাজা আর্থারের বীরত্বকেও হার মানায়। শেষে লেখক বলেছেন যে অনেকেই রাগ করে ভাবে বিড়ালকে যত আদর দেওয়া হোক না কেন, তারা আসলে মানুষদের ভালোবাসে না তারা শুধু সেই বাড়িটাকেই ভালোবাসে যেখানে সে আশ্রয় পায়। এটা একভাবে ঠিক। কারণ তারা জানে যে বাড়ির লোকদের সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করলে তাকে নতুন জায়গাকে নতুন করে চিনতে হবে। পথঘাট, এলাকা চিনতে হবে। এটা সহজ কাজ না। তাই তারা এক বাড়িতেই থেকে যায় আর নতুন লোকেদের সঙ্গে ভাব জমায়।

শব্দার্থ: character (ক্যারেকটার)-ব্যক্তিত্ব, grim (গ্রিম)-মারাত্মক, acrobat (অ্যাক্রোব্যাট)-শারীরিক কসর, loafs (লফস)-অলসভাবে দিন কাটানো, pestered (পেস্টারড)-অতিষ্ঠ, purrs (পারস)-মিউ মিউ স্বরে ডাকা, stoops (স্টুপস)-ঝোঁকা, rakes (রেকস)-আঁচড়ে দেয়, gingerly (জিনজারলি)-সযত্নে, saunters (সন্টরস)-এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো, trot (ট্রট)-খটমট করে চলা, lithe (লিথ)-গাম্ভীর্যপূর্ণ, kindred (কিন্ড্রাড)-এক গোত্রের, gallant (গ্যালান্ট)-সাহসী, reproach (রিপ্রোচ)-দোষ দেওয়া।

1. write T for true statement and F for false.

a. Most people think that the cat is unintelligent. T

b. One can see the cat as he really is in the night. F

c. The cat is not fond of ease. F

d. The cat takes things very easily. T

e. The cat is not a good athelete. F

f. The cat skips to the roof of an empty shade. T

g. Exiled in a new land a cat would have to learn new manners. F

2. Answer the following questions.

a. When does the cat make an appearance to get his share of food?

The cat makes an appearance to get his food when the family sits to tea.

b. Who is the cat particularly civil?

The cat is particularly civil to the guest who is at the table.

c. How does the cat receive the bit of fish handed down by the guest?

The cat receives the bit of fish handed down by the guest by being civil to him, particularly at table.

3. Complete the following sentences with information from the text.

a. The cat sometimes watches a mouse hole for an hour or two.

b. The guest calls the cat poor pussy.

c. cats go for sport as they have more gallant adventure than king Arthur's ever had.

d. The cat droop his head nearly to his paws and sends across a call to his kindred.

4. Put the numbers respectively.

a. All day long the cat loafs about the house.

b. He sometimes watches a mouse.

c. You can see the cat as he really is.

d. The cat gets a great deal more satisfaction out of life.

e. Watch him as the shades of the evening fall.

Ans. d-a-b-e-c.

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আজ আমাদের বিষয় বিজ্ঞান। পৃথিবীতে মানুষ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে একের পর এক জীবজগৎ, বস্তু জগৎ, সৌরজগৎ ও মহাকাশ নিয়ে কত তথ্য প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে চলেছে। নতুন স্থান, পৃথিবীর উৎপত্তি, জীবনের সৃষ্টি এসব নিয়েও অনুসন্ধানের শেষ নেই। আবার জীবনে চলার পথে কত কিছুই না আমাদের লাগে—ঘর-বাড়ি, পোশাক-আশাক, ওষুধ, রকমারি খাবার, যন্ত্রপাতি, টিভি, ফ্রিজ, সাইকেল, গাড়ি ইত্যাদি। এর কোনও শেষ নেই। আজ আমরা এই সম্পর্কিত কিছু কিছু কথা সাধারণ জ্ঞান হিসেবে জেনে নেব।

বিজ্ঞানী ও তাঁদের অবদান:

আইজ্যাক নিউটন: মাধ্যাকর্ষণ, আলোর গতিসূত্র এবং ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন।

রবার্ট হুক: কোষ আবিষ্কার করেন। প্রথম আণুবীক্ষণিক জগৎ আবিষ্কার করেন।

উইলিয়াম হারভে: মানবশরীরে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন।

ইঙ্গ লেহম্যান: পৃথিবীর ভেতরের কঠিন কেন্দ্র আবিষ্কার করেন।

থেলস অফ মিলেটাস: প্রাচীন এশিয়া-মাইনর-এর মিলেটাস বা আধুনিক তুরস্ক-র মিলেট-এর গ্রিক দার্শনিক থেলস হলেন ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী।

জেমস ওয়াট: স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কারক। এঁকে শিল্পবিপ্লবের জনক বলা হয়।

আলস্যান্দ্রো ভোল্ট: তড়িৎ বিজ্ঞানের অগ্রদূত এবং প্রথম তড়িৎ কোষ ও ব্যাটারি আবিষ্কার করেন।

দিমিত্রি ম্যান্ডেলিভ: সমস্ত মৌলগুলিকে আণবিক গুরুত্ব অনুসারে একটি টেবিলে সাজানো অর্থাৎ প্রথম পর্যায়-সারণীর ধারণা দেন।

হেনরি মজিলি: পর্যায়-সারণীর রূপ দেন।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল: তড়িৎ, চৌম্বকত্ব ও আলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তিনটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন।

গ্রেগর ম্যান্ডেল: জিনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।

অ্যাডা লাভলেস: কম্পিউটিং বিজ্ঞান-এর জননী।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং: পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা। এর থেকে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়।

অ্যান্ড্রু-মেরি: অ্যাম্পিয়ার-তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের আবিষ্কর্তা।

এডওয়ার্ড জেনার: ইনি শুধু গুটি বসন্তের টীকার আবিষ্কর্তা নন, তার সঙ্গে টীকা-পদ্ধতির আবিষ্কার করেন যার মাধ্যমে পরে বিভিন্ন রোগের টীকা আবিষ্কার হয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু: বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা আবিষ্কার ও উদ্ভিদে প্রাণের উপস্থিতি প্রমাণ করেন।

লুই পাস্তুর: জীবাণুর সঙ্গে রোগের সম্পর্কের আবিষ্কর্তা।

জোসেফ প্রিস্টলে: অক্সিজেনের আবিষ্কর্তা, যদিও তিনি একে বিশেষ বায়ু বলেই জানতেন।

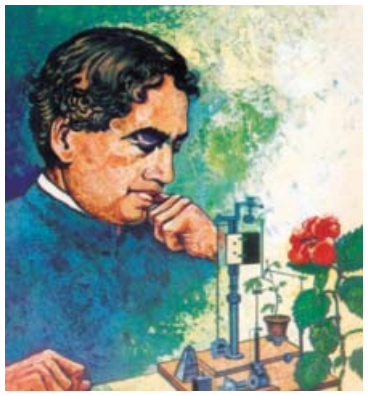

ফ্রেডেরিক ভোলার: জৈব ও অজৈব পদার্থের পৃথকীকরণ।

ব্রহ্মগুপ্ত: শূন্যের ও ভগ্নাংশে তার ব্যবহার আবিষ্কার করেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি: প্রথম টেলিস্কোপ তৈরি করেন।

আর্যভট্ট: গণিতে ত্রিকোণমিতি ও বীজগণিতের আবিষ্কারক।

জোহানেস কেপলার: প্রথম সৌরজগতের সঠিক গঠন বর্ণনা করেন।

জন জে লাউড: প্রথম বলপয়েন্ট পেন বানান।

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল: প্রথম টেলিফোন।

সিনক্লেয়ার: প্রথম কম্পিউটার (ল্যাপটপ) বানান।

কার্কপ্যাত্রিক ম্যাকমিলান: প্রথম বাইসাইকেল বানান।

চার্লস গুডইয়ার: প্রথম ইরেজার বানান।

কার্ল বেনজ: প্রথম পেট্রোল কার বানান।

নিকোলাস এবং জন ল্যুমিয়ের: প্রথম সিনেমা বানান।

পেরিয়ার: প্রথম জাহাজ (বাষ্পচালিত) বানান।

জন লগি বেয়ার্ড: প্রথম রঙিন টেলিভিশন বানান।

জর্জ ক্রাম: পটেটো চিপসের আবিষ্কর্তা। তাঁর তৈরি চিপসের নাম ছিল 'সারা টোগা চিপস'।

ফ্র্যাংক এপারসন: কাঠি আইসক্রিমের আবিষ্কর্তা। এটি তখন 'ফ্রোজেন ললিপপ' নামে পরিচিত ছিল।

ফারদিনান্দ ম্যাগেলান: প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

রিট ভাইরা: প্রথম এরোপ্লেনে ভ্রমণ করেন।

আনেক্সমান্ডার: প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করেন।

ইবন আল-হারথাম: কীভাবে আমরা কোনও কিছু দেখতে পাই তা ব্যাখ্যা করেন।

নিকোলাস স্টেনো: জীবাশ্মের ধারণা দেন।

রেমন্ড স্যামুয়েল টমিলসন: ইমেলের আবিষ্কর্তা। তিনিই @ চিহ্নটি ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

রোমাঞ্চকর ঘটনা:

অক্টোবর, ২০১৩: জানা যায় যে ২৫ কোটি বছর আগে সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি।

১৯৫৮ সাল: কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক ২ লাইকা নামে কুকুর নিয়ে প্রথম মহাকাশে যায়। এর থেকে প্রমাণ হয় মানুষও মহাকাশে যেতে পারবে।

২১ জুলাই ১৯৬৯ সাল: মানুষ (নিল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন) চাঁদে পা দেন।

২৯ মে ১৯৫৩: মানুষ (তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি) প্রথম এভারেস্ট জয় করেন।

১৭৬১ সাল: ফ্রান্সে পৃথিবীর প্রথম পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আবিষ্কার হয়।

১৯০১: প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান চালু হয়। যদিও ১৮৯৫ সালে আলফ্রেড নোবেল এই পুরস্কার প্রচলন করেছিলেন।

কি-বোর্ড প্র্যাকটিস

কি-বোর্ড প্রাকটিস: প্রথম পাঠ

একটির পর একটি কি চেপে বাঁদিকের বা বাঁ হাতের অংশের A থেকে F পর্যন্ত অক্ষরগুলো টাইপ করতে হবে। এরপর তর্জনী আঙুল ডান দিকে একটু বাড়িয়ে G অক্ষরটি টাইপ করতে হবে। প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে দু'টি করে স্পেস দিতে হবে।

বাম হাতের টাইপ: A S D F G

তারপর ডান হাতের অংশের ; থেকে J পর্যন্ত অক্ষরগুলো টাইপ করতে হবে। এরপর তর্জনী আঙুল বাম দিকে একটু বাড়িয়ে H অক্ষরটি টাইপ করতে হবে। প্রতিটি অক্ষরের মাঝে যথাক্রমে দুটি করে স্পেস দিতে হবে।

ডান হাতের টাইপ: ; l k j h

এন্টার-কি চেপে নিচের লাইনে গিয়ে উপরোক্ত নিয়মে স্পেস দিয়ে প্রথমে বাঁ এবং পরে ডানদিকের অক্ষরগুলো টাইপ করতে হবে।

a s d f g ; l k j h

এভাবে কমপক্ষে ১০০ বার এই টাইপগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। কোনও অক্ষর ভুল হলে ব্যাকস্পেস-কি চেপে মুছে ফেলে আবার লিখতে হবে। যতক্ষণ কি-বোর্ডের দিকে বা মনিটরের দিকে না তাকিয়ে লেখা অভ্যাস হচ্ছে ততক্ষণ একই টাইপ প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় পাঠ অভ্যাস করতে হবে।

এরপর Enter-কি চেপে নীচের টাইপ প্র্যাকটিস করতে হবে কমপক্ষে ১০ বার: dada; sada; kala; kada; iasad; fashad

এবার ফাইলটি সেভ করতে হবে (Ctrl+S) কি-বোর্ড কমান্ড ব্যবহার করে।

কি-বোর্ড প্র্যাকটিস: দ্বিতীয় পাঠ (শিফট-কি ব্যবহার)

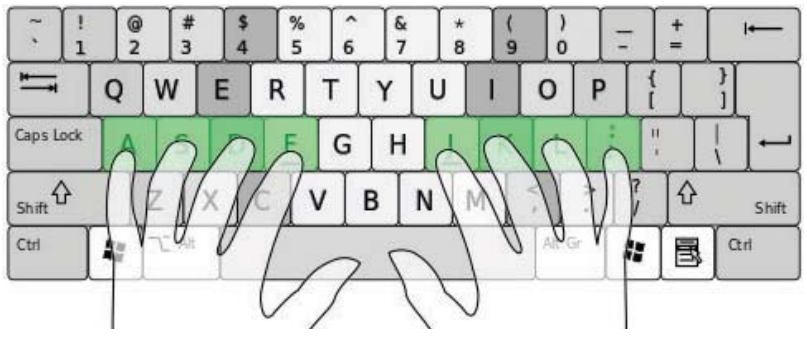

এবার শিফট-কি ব্যবহার করে টাইপ করতে হবে। কারণ এই পাঠের অক্ষরগুলো বড় হাতের অক্ষর। আর বড় হাতের লেখার অক্ষর লেখার নিয়ম হল শিফট-কি চেপে ধরে উক্ত অক্ষরটি লিখতে হবে। লেখার নিয়ম হলো বাঁ-হাতের বা বাঁ-পাশের বড় হাতের অক্ষর টাইপ করতে ডানদিকের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে শিফট-কি চেপে ধরে বাঁ-হাতের টাইপগুলো করতে হবে। ঠিক একইভাবে ডানদিকের অক্ষরগুলো টাইপ করতে বাঁ-হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে শিফট-কি চেপে ধরে ডান হাতের অংশের টাইপগুলো করতে হবে। প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে দু'টি করে স্পেস দিতে হবে। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য প্রত্যেকবার শিফট-কি চেপে নিচের পাঠগুলো কমপক্ষে ১০০ বার টাইপ করতে হবে।

বাঁ-হাতের টাইপ: A S D F G

ডান হাতের টাইপ: L K J H

এন্টার-কি চেপে নিচের লাইনে গিয়ে উপরোক্ত নিয়মে স্পেস দিয়ে প্রথমে বাঁ এবং পরে ডানদিকের অক্ষরগুলো টাইপ করতে হবে।

A S D F G : L K J H

এভাবে কমপক্ষে ১০০ বার এই টাইপগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। কোনও অক্ষর ভুল হলে ব্যাকস্পেস-কি চেপে মুছে ফেলে আবার লিখতে হবে। যতক্ষণ কি-বোর্ডের দিকে বা মনিটরের দিকে না তাকিয়ে লেখা অভ্যাস হচ্ছে ততক্ষণ একই টাইপ প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপর তৃতীয় পাঠ অভ্যাস করতে হবে।

এরপর নীচের টাইপ প্র্যাকটিস করতে হবে কমপক্ষে ১০ বার:

DADA; SADA; KALA; KADA; JASAD; FASHAD;

Dada; Sada; Kala; Kada; Jasad; Fashad;

এবার ফাইলটি সেভ করতে হবে (Ctrl+S) কি-বোর্ড কমান্ড ব্যবহার করে।

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে

'বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে'। বিভাগ থাকবে। এই বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, তোমাদের বাবা-মায়েরা আর অবশ্যই তোমরা।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

একঘেয়েমি কাটাতে পড়াশোনার মাঝে ছবি আঁকতে পারো, গল্প ও ছড়া লিখতে পারো। দেখবে পড়াশোনায় আরও আগ্রহ পাবে। আর হ্যাঁ, রবিবারের সাহিত্যের ক্রোড়পত্রে এখন থেকে তোমাদের জন্যও ‘ছোটদের বৈঠক’ নামে একটা পাতা থাকছে। সেখানের জন্যও তোমরা তোমাদের আঁকা, গল্প, ছড়া-কবিতাগুলো মেল করে পাঠিয়ে দিতে পারো। ছেপে বেরোলে দেখবে কত ভালো লাগবে তোমাদের।

আগামিকাল
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে
বিনামূল্যে

১৩ থেকে ২০ ডিসেম্বর

মহান ব্যক্তিত্ব

প্রতাপচন্দ্র সাহা (গণিত শিক্ষক, মুড়াগাছা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়)

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী
শহীদ বিনয়কৃষ্ণ বসু
জন্ম: ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮
মৃত্যু: ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩০

কারা বিভাগের আইজি সিম্পসন রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য কুখ্যাত ছিলেন। বিপ্লবীরা সিম্পসনকে চরম শাস্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য রাইটার্স ভবন আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ইউরোপীয় পোশাক পরে রাইটার্স ভবনে প্রবেশ করেন ও সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে গুলিবিনিময় শুরু হয়। টেয়ানাম, প্রেন্টিস, নেলসন সহ আরও কিছু পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ হন। তবে অচিরেই তিন বিপ্লবীর গুলি শেষ হয়ে যায়। ধরা না দেওয়ার জন্য তাঁরা সঙ্গে আনা ‘সায়নাইড’-বিষের পুরিয়াগুলি মুখে পুরে দেন এবং মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকেই নিজের মাথায় গুলি করেন। বাদল তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

অনন্য সাহিত্যিক
শিবরাম চক্রবর্তী
জন্ম: ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩
মৃত্যু: ২৮ আগস্ট, ১৯৮০

কবিতা-রচনা দিয়ে সাহিত্য-জীবনের শুরু। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘ভারতী’ পত্রিকায়। প্রথম দুটি বই প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। তারপর অজস্র লেখা লিখেছেন। প্রবন্ধ, নাটক এবং অজস্র হাসির গল্প। লিখেছেন ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা ও ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’ নামে এক অনন্য স্মৃতিকথা। লিখেছেন প্রবন্ধ যেমন ‘মস্কো বনাম পন্ডিচেরি’ ও ‘ফানুস ফাটাই’, নাটকের গ্রন্থ ‘যখন তারা কথা বলবে’। সৃষ্টি করেছেন ‘হর্ষবর্ধন’ ও ‘গোবর্ধন’ নামের দুই কালজয়ী চরিত্র। বিচিত্র জীবন ছিল তার। রাজনীতি করেছেন, জেল খেটেছেন, রাস্তায় কাগজ ফেরি করেছেন, ফুটপাথে রাত্রিবাস করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন, আজীবন মেস-জীবন যাপন করেছেন। চিরকুমার শিবরাম কলকাতা শহরে এসে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের একটি কক্ষে থেকেছিলেন দীর্ঘ ৪০ বছর, আমৃত্যু।

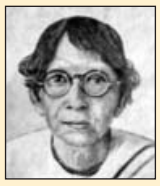

পল্লীপ্রেমী কবি এবং শিক্ষাবিদ
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
জন্ম: ১ মার্চ, ১৮৮৩
মৃত্যু: ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০

পল্লীর মানুষ ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যের প্রাণ। সহজ-সরল রূপ কাব্যের আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।’ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—উজানী (১৯১১), বনতুলসী (১৯১১), শতদল (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বনমল্লিকা (১৯১৮), নূপুর (১৯২০), রজনীগন্ধা (১৯২১), অজয় (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮) ইত্যাদি।

তিনি ‘সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক’ (১৯০৫) ও ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ এবং ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মশ্রী’ উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বীর বিপ্লবী
শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
জন্ম: ২৩ জুন, ১৯০১
মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৭

তাঁর জন্ম পাবনা জেলার মোহনপুরে। তাঁর পিতার নাম ক্ষিতীশমোহন লাহিড়ী। উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস হিন্দু বিদ্যালয়ে আসেন। তিনি শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে UAIRP দল গঠন করেন। এই দল পরে বেঙ্গল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে Hindusthan Socialist Republican Association রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। তাই তিনি এবং তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যরা মিলে ৯ আগস্ট ১৯২৫ সালে কাকোড়ি স্টেশনের কাছে ট্রেন থেকে সরকারি সম্পদ লুট করেন। লুণ্ঠিত সম্পদ তাঁরা অস্ত্রাদি কেনার কাজে ব্যয় করেন। এমনকী বোমা বানানোর প্রণালি শেখার জন্য রাজেন্দ্রনাথ বোমা বানানোর কারখানায় কাজ করাও শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি পূর্ববর্তী দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার কারণে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে গোন্ডা জেলের ফাঁসিরও মঞ্চে আত্মবলিদান করেন।

কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক
দেবেশ রায়
জন্ম: ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৬

জন্ম তার পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। ১৯৪৩ সালে তিনি পরিবারের সঙ্গে জলপাইগুড়ি চলে যান। ‘যযাতি’ দিয়ে দেবেশ রায়ের উপন্যাসের সূচনা। রাজনীতি যখন নকশালবাড়ি ও জরুরি অবস্থায় টালমাটাল,

বাংলা সাহিত্যে তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চারের সূচনা ঘটে সেই ১৯৭০-এর দশকে। মানুষ খুন করে কেন, মফস্বলী বৃত্তান্ত, সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত-একের পর এক উপন্যাসের অফুরন্ত প্রবাহ পাঠকের অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে থাকে। এ অভিজ্ঞতা তুঙ্গে পৌঁছয় তাঁর তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত-এ। উপন্যাসটির জন্য ১৯৯০ সালে তিনি অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-প্রতিষ্ঠিত ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি এক দশক ‘পরিচয়’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
জন্ম: ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৩
মৃত্যু: ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

১৯২০ সালে তিনি তৈরি করেন মারণরোগ কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন। কালাজ্বর ছাড়াও তিনি ফাইলেরিয়া, ডায়াবেটিস, কুষ্ঠ, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি নিয়েও গবেষণা করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখেছিলেন ‘ট্রিটিজ অন কালাজ্বর’।

উপেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভ্য, ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৩৬) সভাপতি এবং নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করে দেশীয় ওষুধ প্রস্তুত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন তাঁকে মিন্টো পদক দিয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তাঁকে ‘স্যার উইলিয়াম জোনস’ পদকে সম্মানিত করেছিল। এছাড়াও তিনি ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রথম পাতার পর

এর প্রয়োজন শুধু যিনি ল্যাবরেটরিতে বসে নতুন আবিষ্কার করেন তাঁর একার হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব সময় লাগে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠা বা ঘুমোতে যাওয়া এমনকী ঘুমিয়ে থাকার সময়েও আমরা বিজ্ঞানকেই সঙ্গে নিয়ে চলি। রোজকার প্রাথমিক প্রয়োজন, যেমন, খাবার-পোশাক-মাথার ওপরে ছাদ-ওষুধ যাই ভাবি না কেন, তা আসলে বিজ্ঞান। আবার বিলাসিতা বা শখের সব জিনিসেও বিজ্ঞান। এমনকী স্কুলের বই-খাতার পাতা, পেনসিল, ইরেজার, পেন সব কিছু বিজ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ। এই তালিকা শেষ করা যাবে না। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে অর্থাৎ বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান জ্বালিয়ে বা আধুনিক ফোন, টিভি ব্যবহার করে বা গাড়ি চড়ে বা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে কি শুধু বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেওয়া যায়? যখন কেউ এক চোখ বা এক শালিক দেখলে দুর্ভাগ্যের আশংকায় মুষড়ে পড়ে, একটু বিপদে পড়লে হাতের রেখা পড়াতে বা নিজে পাথর, মাদুলি পড়তে যায়, কারোর মৃগি বা অন্য কোনও নার্ভের রোগ হলেই ভাবে ভূতে ধরেছে আর ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করায় তখনও এই বিজ্ঞানের দরকার হয়। এরকম উদাহরণেরও শেষ নেই। আমাদের স্কুলের বইগুলোতে যা কিছু পড়ানো হয় তার উদ্দেশ্য একটাই থাকে যে আমরা যেন সত্যকে চিনে নিতে পারি। ভুলের ফাঁদে না জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু কীভাবে সত্যকে চিনে নেওয়া যাবে তা নিজের ওপরেও অনেকটা নির্ভর করে। মনের ভেতরের অন্ধকার তাড়াতে বিজ্ঞান দরকার। বিজ্ঞান আসলে যুক্তিবাদী মনের ফসল। তাই ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য সবেতেই কোনও-না-কোনও রকমের বিজ্ঞান জড়িয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাই এটা বলতেই হয় ভালো পড়াশোনা মানে কিন্তু শুধুই বই পড়া, মুখস্থ করা, সুন্দর হাতের লেখায় সুন্দর ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়। এটা অবশ্যই জ্ঞান প্রকাশের একটা মাধ্যম। এরও গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু যা পড়ছি তা বোঝা, আত্মস্থ করাই হল আসল শিক্ষা। শিক্ষা যেন অন্তরের বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা বই-খাতায় আবদ্ধ নয়। আবার বই-খাতাতেই শুধু তার প্রতিফলন নয়।

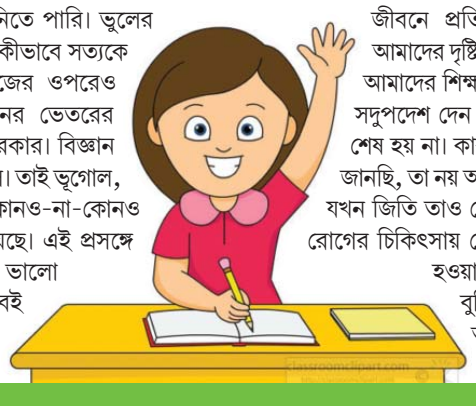

রোজকার জীবনে আমরা কী বিশ্বাস করছি, আমরা কীভাবে জীবনে প্রতিটা পদক্ষেপ নিচ্ছি, অন্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি—এসব কিছুই শিক্ষার প্রকাশ। তাই আমাদের শিক্ষক বা যে কোনও মানুষ যিনি আমাদের সদুপদেশ দেন তাঁরা একটাই কথা বলেন, জ্ঞানচর্চার শেষ হয় না। কারণ প্রতিনিয়ত শুধু নতুন নতুন জিনিস জানছি, তা নয় অজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রতিনিয়ত যখন জিতি তাও তো বিজ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের চর্চা। বসন্ত রোগের চিকিৎসায় দেবীর দ্বারস্থ না হয়ে ডাক্তারের দ্বারস্থ হওয়া বা সঠিক সময়ে টীকা নিতে যে বিচার বুদ্ধি বা যুক্তির প্রয়োজন, তার উপস্থিতিই আমাদের শিক্ষিত বলে পরিচয় দেয়।

পরের সংখ্যায় আরও নতুন কিছু...পড়তে থাকো উত্তরণ